গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ২৬ সংখ্যা | ৭ - ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

জনবিরোধী কেন্দ্রীয় বাজেট শুধু পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করবে

২০২০ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

এ দেশের জনগণ যে দুর্বিষহ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর দীর্ঘ বাজেট বক্তৃতায় তার কোনও চিহ্ন নেই। কিছু চমক দেওয়ার চেষ্টা আর হাস্যকর কিছু আশাবাদের কথা ছাড়া জনজীবনের মূল সমস্যাগুলির কোনও একটি বিষয়ও এই বাজেটে স্থান পায়নি। অর্থমন্ত্রী নিজেই বাজেট বক্তৃতায় পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন, ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির যন্ত্রণা, বিরামহীন ভাবে বেড়ে চলা জ্বালানির দাম, দিন দিন বাড়তে থাকা বেকারি, বিপুল সংখ্যায় শ্রমিক ছাঁটাই, একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো যে আর্থিক পরিস্থিতি মানুষের জীবন জেরবার করে দিচ্ছে, তা নিয়ে সরকারের বলবার মতো কিছু নেই। সাধারণ মানুষের আয় ক্রমাগত কমছে, বাজারে চাহিদা কমে চলেছে, কমছে মানুষের ভোগব্যয়ের ক্ষমতা, চাষির ফসলের লাভজনক দাম নেই, ক্রমবর্ধমান মন্দার সাথে যুক্ত হয়েছে দিন দিন বেড়ে চলা মুদ্রাস্ফীতি। কর্পোরেট ধনকুবের মালিকদের প্রতি সদয় দাক্ষিণ্য আর কর আদায়কারী ব্যবস্থায় লাগামছাড়া দুর্নীতির কল্যাণে রাজস্ব আদায়ের ঘাটতি বেড়েই চলেছে। উৎপাদনের মূল ক্ষেত্রগুলিতে কার্যকরী বিনিয়োগ নেই, বারবার সুদ কমিয়েও ব্যাঙ্ক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ঋণ নেওয়ার মতো শিল্পসংস্থা মিলছে না। কেন যে সরকার জনস্বার্থবাহী কাজে ব্যয়বৃদ্ধি করছে না, তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এই সমস্ত সমস্যার কোনওটি নিয়েই কিছু বলেননি। তিনি ব্যাখ্যা করেননি, এক শতাংশ অতি ধনীর হাতে দেশের

দুয়ের পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর নকলে অর্থমন্ত্রীও বাকসর্বস্ব

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন তাঁর দ্বিতীয় বাজেট পেশ করেছেন। বলা হচ্ছে, এটাই নাকি দীর্ঘতম বাজেট বক্তৃতা। কিন্তু তাতে দেশের মানুষের জন্য আছেটা কী? সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিজেপির তাবড় সব নেতারা কেউই সুনির্দিষ্ট কিছু বলতে পারছেন না। বিরাট বক্তৃতার বিশাল নথিটি দেশের মানুষের কোন কম্মে লাগবে তাই স্পষ্ট হচ্ছে না। নরেন্দ্র মোদি জমানায় সরকারের বৈশিষ্ট্য হল, আসল কাজ কিছু করার দরকার নেই। কোনও ভাবে একটা তাক লাগিয়ে দিতে পারলেই হল! অনেকটা যেন লম্বা দাড়ি রেখে রেকর্ড করে পৃথিবীবিখ্যাত হওয়ার মতো চেষ্টা।

দেশের সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের কেনার ক্ষমতা কমে যাওয়া। গ্রামীণ ভারতে যা আরও মারাত্মক আকার নিয়েছে। সরকারের লেবার বুরোর হাউসহোল্ড সার্ভে দেখিয়েছে গ্রামীণ মজুরির প্রকৃত হার অক্টোবর ২০১৯-এ প্রায় ৪.৭ শতাংশ কমে গেছে (দ্য হিন্দু, ২.০২.২০২০)। যা মূল্যবৃদ্ধি তাতে মজুরির হার আরও অনেকটাই কমবে। কিছুদিন আগেই নানা বেসরকারি কোম্পানির কর্তারা বারবার বলেছিলেন, গ্রামে দু'টাকার শ্যাম্পু, পাঁচ টাকার বিস্কুটের প্যাকেট কিনতে গেলেও মানুষ দশবার ভাবছে। দেশের মানুষের এই ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়াকে অর্থনীতির সাময়িক ঝিমুনি, বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রভাব ইত্যাদি নানা কিছু বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছে সরকার। কিন্তু এটাই যে দেশের অর্থনীতির মূলকাঠামোটিতেই পুরোপুরি ঘুণ ধরে যাওয়ার প্রকাশ, তা সরকার স্বীকার করেনি। যদিও যে সরকার দু'দিন আগেও মানতে চাইছিল না যে, দেশে আদৌ কোনও আর্থিক সংকট আছে, তারা আজ অন্তত আন্তর্জাতিক মন্দার দোহাই পেড়ে মন্দার উপস্থিতিটুকু মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু কোন জাদুতে দেশের বাজারে চাহিদা বাড়বে? অর্থমন্ত্রী লম্বা বক্তৃতাতেও সে কথাটুকু উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন! চাহিদা বাড়ানোর জন্য তিনি পরিকাঠামো অর্থাৎ ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট-ব্রিজ ইত্যাদি তৈরিতে বেসরকারি পুঁজিকে ছাড় দিয়ে অনেক আশা দেখিয়েছেন। আর তার সাথে বেচে দিয়েছেন এলআইসির মতো সরকারি সংস্থাকে— যে সংস্থার ভরসায় বহু সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের পরিবারের দিন গুজরান হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, বিএসএনএল, এয়ার ইন্ডিয়া, এইচপিসিএলের মতো লাভজনক কোম্পানি বেচে তাঁর সরকার আগেই 'বেচারাম সরকার' নাম কিনেছে। এবার এলআইসি বেচে পুরোপুরি বুঝিয়ে দিয়েছেন দেশের মানুষের কষ্টের টাকায় গড়া সম্পদ বিক্রি করাই তাদের সরকারের একমাত্র উপায়। বিজেপি যাদের দাসত্ব করতে সরকারে এসেছে, গত বাজেটে সেই কর্পোরেট প্রভুদের ১ লক্ষ কোটি টাকা করছাড় দিয়ে সরকারের রাজস্বের হাল ভাঁড়ে মা ভবানী। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলের এক লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেও তা পূরণ করা যায়নি। এতে বাজারও চাঙ্গা হয়নি। এ দিকে রাজকোষ ঘাটতি সামাল দিতে অর্ধেক করতে হয়েছে খাদ্যসুরক্ষার বাজেট। কমেছে গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের বরাদ্দ। অর্থমন্ত্রী বলেছেন তাঁর বাজেটের পাতায় পাতায় নাকি এত কর্মসংস্থানের ফিরিস্তি আছে, যে তা পড়তেই তাঁর সময় লেগে গেছে। কিন্তু কোথায় কর্মসংস্থান? গত

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিদ্যাসাগরের স্বপ্ন নিয়ে ছাত্রদের অঙ্গীকার যাত্রা সাড়া ফেলল রাজ্যে

শুরু হল অঙ্গীকার যাত্রা। শিলিগুড়ি। ১ ফেব্রুয়ারি

মহান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে বহন করে, এ দেশের মাটিতে যথার্থভাবে ধর্মনিরপেক্ষ-বৈজ্ঞানিক-গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে আরও শক্তিশালী আরও সংহত করতে, সাত দিন ব্যাপী (১ - ৭ ফেব্রুয়ারি) 'অঙ্গীকার যাত্রা'য় সামিল হল এ রাজ্যের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী। এ কম বড় কথা নয়। এ খুব সহজ ব্যাপার নয়। যুগে যুগে ছাত্র-যুবকরাই যুগনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে ঠিকই। কিন্তু বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে, চতুর্দিকে যখন আত্মসর্বস্বতার নিত্যনব উস্কানি, নিছক ব্যক্তিগত কেরিয়ারের প্রবল হাতছানি, তখন বিদ্যাসাগরের মতো মনীষীদের স্বপ্ন পূরণ করার মন এবং মনন যে পাল্টা শক্তি সঞ্চয় করছে— এ অত্যন্ত বিরল প্রাপ্তি। তাই, বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবর্ষ উপলক্ষ্যে এ দেশের একমাত্র বিপ্লবী ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন-এর আহ্বানে এই 'অঙ্গীকার যাত্রা' গোটা রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে মুগ্ধ, বিস্মিত করছে। তাদের মনে যোগাচ্ছে আশা-ভরসা, প্রবল উদ্দীপনা। বর্তমান সময়ে সারা দেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বাতাবরণ সৃষ্টিকারী এবং ধর্মের নামে বিভাজনকারী এনআরসি-এনপিআর-সিএএ ইত্যাদির মতো ষড়যন্ত্রমূলক সরকারি নীতিকে প্রতিহত করতে, শিক্ষার ন্যূনতম অধিকারটুকুও সাধারণের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া এবং নারী সমাজের উপর ঘটে চলা চূড়ান্ত লাঞ্ছনা-অবমাননার বিরুদ্ধে প্রায় ১০০০ কিলোমিটার পথ পরিক্রমণ করছে এই 'অঙ্গীকার যাত্রা'। এই পথেও তারা অগণিত অজানা-অচেনা ছাত্র-যুবকের হৃদয়ে সৃষ্টিশীলভাবে রোপণ করছে বিদ্যাসাগরের অপূরিত স্বপ্নের বীজ। দারিদ্রপীড়িত উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবনের অভাব-অনটনে চলা মৎস্যজীবী পরিবারের ছাত্রছাত্রী-সহ হাজার হাজার তরুণ প্রাণের সৃজনশীল অংশগ্রহণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মনুষ্যত্ব রক্ষার এই 'অঙ্গীকার যাত্রা'কে মানুষ দেখছে অন্ধকারের মাঝে আশার উজ্জ্বল আলোক হিসাবে।

পাঁচের পাতায় দেখুন

অর্থমন্ত্রীও বাকসর্বস্ব

একের পাতার পর

আর্থিক বছরে বেকারত্বের হার ছিল ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বাধিক। অর্থমন্ত্রী তার সমাধান কী করেছেন? তিনি দাওয়াই দিয়েছেন সরকারি চাকরির সংস্থা তৈরি হবে, এখন থেকে একটি পরীক্ষাতেই যেন জুটে যাবে সরকারি চাকরি। অথচ বলেননি সরকারি চাকরি বলতে দেশে কতটুকু তাঁরা অবশিষ্ট রেখেছেন? সরকারি চাকরি যা আছে তার বেশিরভাগটাই আউটসোর্সিং করে দিয়েছেন।

কর্মসংস্থান হবে কোথা থেকে? এ বছরের অক্সফ্যাম রিপোর্ট বলছে, ১৩০ কোটি জনসংখ্যার দেশে যেখানে ৭০ শতাংশ লোকের হাতে যত সম্পদ আছে তার চার গুণ বেশি সম্পদ জমা হয়েছে ১ শতাংশের হাতে। এই ভয়াবহ বৈষম্যই তো দেখিয়ে দিচ্ছে ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা পুরোপুরি অচলাবস্থায় পৌঁছেছে। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ', 'উন্নয়ন চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়া'র তত্ত্ব— এসব কোনও বাগাড়ম্বরেই যে কাজ হবে না তা মন্ত্রী না বুঝতে পারেন, জনগণ হাড়ে হাড়ে বোঝে।

দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হারে অনেক কারচুপি করেও বাজেটের তথ্যে অর্থমন্ত্রী তাকে ৫ শতাংশের উপরে তুলতে পারেননি। তাঁর রাজকোষ ঘাটতিতে রাশ টানার লক্ষ্যমাত্রাও যে পূরিত হয়নি সে কথাও তাঁকে মানতে হয়েছে। তারপরেও অর্থমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন, আগামী বছরে বাজার চাঙ্গা হবে এবং জিডিপি বৃদ্ধির হার ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। কোন ম্যাজিকে? সরকারের সমর্থক আর কর্পোরেট মিডিয়ার ভাষ্যকাররা বলে চলেছেন, আবাসন আর পরিকাঠামো শিল্পে যে ছাড় দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী, তাকে ধরেই বাড়বে সাধারণ মানুষের রোজগার, বাড়বে কেনাকাটা। কাটবে আর্থিক সংকট। কিন্তু মূল ক্ষেত্রগুলিতে সংকট কাটার কোনও লক্ষণ অতিবড় বিজেপি সমর্থকের পক্ষেও বোধহয় দেখা সম্ভব হচ্ছে না।

এর জন্য কী দরকার ছিল? বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের একটি অংশ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন, শহর এবং গ্রামের কোটি কোটি মানুষের হাতে বাড়তি রোজগার, বাড়তি টাকার বন্দোবস্ত করে না দিলে বাজারের মন্দা কাটার কোনও পথ নেই। তারাও লিখছে, কর্পোরেট কর কমিয়ে, উচ্চমধ্যবিত্তদের কিছু আয়কর ছাড় দিয়ে আর যাই হোক, বাজারের চাহিদা বাড়ানো যাবে না। তার জন্য গ্রামের এবং শহরের নিতান্ত সাধারণ মানুষের হাতে টাকার জোগান দিতে হবে। অর্থমন্ত্রী করেছেন তার উল্টো কাজটি। তিনি অক্সিজেন দিতে চেয়েছেন কর্পোরেট মালিকদের। ছাড় দিয়েছেন রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায়ীদের আর কৃষি বরাদ্দ কমিয়েছেন।

অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন কৃষির উন্নতির জন্য তিনি বিরাট সুযোগ করে দিচ্ছেন। কী ভাবে? কৃষি ফসল পরিবহণের জন্য 'কিসান রেল' আর 'কিসান উড়ান' চালু হবে। তাতে কোন উন্নতিটা হবে? রেলের ঠাণ্ডা ওয়াগন আর বিমানের পেটে ভরে কৃষকরা তাঁদের ফসল দেশের নানা প্রান্তে পাঠিয়ে দিতে পারবেন! অর্থাৎ কৃষি ব্যবসা জমবে! কারা নিতে পারবে এই আধুনিক সুবিধা? উত্তরটা দিতে গেলে অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ হতে হয় না, একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকলেই চলে। এর সুবিধা নেবে ভারতের বিশাল কৃষিক্ষেত্রে থাবা বসাতে যারা উদগ্রীব, সেই সব দেশি-বিদেশি কর্পোরেট হাউস। তাতে রিলায়েন্স, আদানি গোষ্ঠী, গোয়েঙ্কা, টাটা কিংবা আইটিসির মতো গোষ্ঠীদের লাভ। লাভ ওয়ালমার্ট, পেপসিকোর মতো দৈত্যাকার খাদ্য ব্যবসায়ী কোম্পানির। চাষির কী লাভ? তাদের হাতে বাজারের চাবিকাঠি অর্থাৎ বিপুল পুঁজি আছে নাকি?

সরকার কী করেছে? এবারের বাজেটে খাদ্য সুরক্ষায় শস্য কেনার বরাদ্দ ১ লক্ষ ৫১ হাজার কোটি টাকা থেকে কমে ৭৫ হাজার কোটি টাকা হয়েছে। অন্যান্য শস্য সংগ্রহের বাজেট ১ হাজার কোটি টাকা কমেছে। (ইকনমিক টাইমস, অনলাইন এডিশন, ১.০১.২০২০) অর্থাৎ শস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ার বদলে কমতে চলেছে। এমনিতেই গত বছর মোদি সরকারের দ্বিতীয় দফা বাজেটে শস্য সংগ্রহের জন্য যে বরাদ্দ ছিল সরকার তার মাত্র ২.৮৮ শতাংশ কাজে লাগিয়েছে (দ্য হিন্দু, ২.০২.২০২০)। এবারে বরাদ্দ কমে অর্ধেক হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে সরকার কৃষকের ফসল ন্যায্য দামে বিক্রির বিষয়ে আদৌ ২মাথা ঘামাচ্ছে না। সারে ভর্তুকি কমেছে ১০ হাজার কোটি টাকা, প্রধানমন্ত্রী আনন্দ আয় সংরক্ষণ অভিযান প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষককে ক্ষতিপূরণের বরাদ্দ অর্ধেক ছাঁটাই করা হয়েছে। মোট কৃষি বাজেট ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও বাস্তবে মূল্যবৃদ্ধির নিরিখে এটা বৃদ্ধি নয়, বরং বরাদ্দ কমেছে। মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্প যা ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প বলে পরিচিত, তাতে বরাদ্দ কমেছে ১০ হাজার কোটি টাকা। ফলে গ্রামে কর্মসংস্থান কমবে।

সোস্যাল মিডিয়া থেকে প্রাপ্ত

উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে শুধু বাজেট কমেছে তাই নয়, শিক্ষার দরজাকে পুরোপুরি ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের সামনে খুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে দেশের সাধারণ ঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে শিক্ষার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। শিক্ষায় ব্যবসা এবং মুনাফাই এখন একমাত্র লক্ষ্য। স্বাস্থ্য খাতেও সামান্য কিছু বরাদ্দ বাড়ানোর কথা বললেও আসলে জনস্বাস্থ্য থেকে সরকার যে পুরোপুরি সরে যাচ্ছে সেটাই দেখা যাচ্ছে বাজেটে। একমাত্র স্বাস্থ্যবিমাকেই সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবা বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছে।

বাজেটের সামগ্রিক পর্যালোচনা দেখাচ্ছে এবারের বাজেট একটি অন্তঃসারশূন্য বাজেট। এ দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতি প্রভুদের সেবায় নিজেদের মন-প্রাণ ঢেলে নরেন্দ্র মোদির সরকার যে বাজেট এনেছে তাতে নিজেদের দেউলিয়া দশাটা আরও প্রকট হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেট

একের পাতার পর

অধিকাংশ সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার মধ্য দিয়ে দেশবাসীর ৭০ শতাংশ শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তকে অতল দারিদ্রের দিকে ঠেলে দিয়ে তাঁদের বহুল প্রচারিত 'ইনক্লুসিভ গ্রোথে'র তত্ত্বটি কেমন চরিতার্থ হল!

প্রকাশিত সমস্ত তথ্য, জনগণের শোচনীয় জীবনযাত্রার মান যে সত্যকে তুলে ধরছে, অর্থমন্ত্রী দেশের মানুষের সাথে মিথ্যাচার করে তুলে ধরেছেন তার বিপরীত বৃহত্তর অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, দারিদ্র দূরীকরণের সাথে ১০ শতাংশ বৃদ্ধির কিছু ভাসা ভাসা হিসাব। এলআইসি সহ নতুন নতুন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণ ও রেল সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বেশি বেশি করে পিপিপি মডেলের মাধ্যমে বেসরকারিকরণের পথ প্রশস্ত করছে সরকার। আরও উল্লেখযোগ্য হল, শিক্ষায় ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে জনকল্যাণের এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রকে অবাধ ব্যবসার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।

অন্য দিকে পুরো বিপরীত চিত্র দেখা গেছে 'সহজে ব্যবসার সুযোগ' করে দেওয়ার নামে কর্পোরেট ক্ষেত্রকে নতুন নতুন করছাড়ের ঘোষণায়। ব্যক্তিগত আয়কর ছাড়ের ঘোষণার আড়ালে এতদিন পর্যন্ত কর সাশ্রয়কারী বিনিয়োগে যে ছাড়গুলি পাওয়া যেত তা তুলে নেওয়া হয়েছে। আর একবার শোনানো হয়েছে বিশ্ব অর্থনীতির দুর্বল বৃদ্ধির কারণে ভারতীয় অর্থনীতির ঝিমিয়ে পড়ার তত্ত্বের ফাটা রেকর্ডটি। যদিও একই সাথে ভারতীয় শাসক শ্রেণি অর্থাৎ একচেটিয়া বুর্জোয়ারা এবং তাদের প্রসাদধন্য অর্থনীতিবিদ-লেখক-ভাষ্যকাররা বাজেটের আগের দিন পর্যন্ত গর্বের সাথে প্রচার করেছেন— বিশ্বব্যাপী মন্দা সত্ত্বেও ভারতের শক্তিশালী আর্থিক বৃদ্ধির তত্ত্ব।

এক কথায়, দেশের যে লক্ষ কোটি জনগণের কাছে ভোটের আগে বিজেপি প্রতিশ্রুতির ফোয়ারা ছুটিয়েছিল, এই বাজেট সেই জনগণ নয়, বিজেপি যে পুঁজিপতি প্রভুদের পলিটিক্যাল ম্যানেজারের ভূমিকা পালন করে চলেছে, তাদেরই সেবা করবে। ফলে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কোনও অবসান হবে না।

এই পরিস্থিতিতে দেশের মানুষের কর্তব্য হল, এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল হওয়া।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার রাজাপুর করাবেগ অঞ্চলের প্রবীণ পার্টি কমরেড বিপিন মালী ২১ জানুয়ারি তাঁর বাসভবনে প্রয়াত হন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। '৬৭ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের সময় কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে কৃষক আন্দোলনে যোগ দেন। তারপর থেকে তিনি অঞ্চলের একজন বলিষ্ঠ এবং সাহসী পার্টি কর্মী হিসাবে পরিচিত হন। তিনি সব সময় নীরবে দলের কাজ করে গিয়েছেন এবং তাঁর পরিবারের সকল সদস্যকে দলের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। শেষজীবন পর্যন্ত দলের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও আনুগত্য অটুট ছিল।

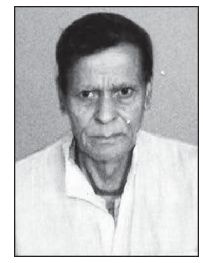

তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজাপুর গ্রামের মানুষ এবং রাজাপুর করাবেগ অঞ্চলের দলের কর্মী-দরদিরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

৩০ জানুয়ারি রাজাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন তাঁর যৌবনের সাথী কমরেড দিবাপতি মণ্ডল। বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তরুণ নস্কর এবং কমরেডস আনারুল ইসলাম, কাশীনাথ সাঁফুই ও গৌর হালদার। সভায় উপস্থিত ছিলেন কমরেড সুবীর দাস।

কমরেড বিপিন মালী লাল সেলাম

উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়া লোকাল কমিটির কর্মী কমরেড সুবোধ কুণ্ডু দীর্ঘ রোগভোগের পর ১০ জানুয়ারি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। ২৪ জানুয়ারি তাঁর স্মরণসভা তাঁর বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। হাবড়ায় পার্টির কর্মী সমর্থক, তাঁর আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীরা স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড গোপাল বিশ্বাস, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অনুকূল ভদ্র এবং কমরেড তপন বিশ্বাস। সভাপতিত্ব করেন কমরেড সাধন ঘোষ। কমরেড কুণ্ডু শিক্ষকতা করতেন। অবসর গ্রহণের পর গণআন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং দরিদ্র মানুষদের আপনজন হয়ে ওঠেন। তিনি ছোটদের প্রতি স্নেহপ্রবণ ছিলেন। বিদ্যুৎ আন্দোলনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

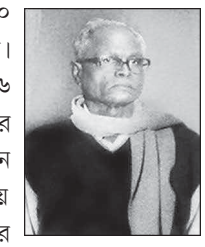

কমরেড সুবোধ কুণ্ডু লাল সেলাম

মোদি সরকারের শাসনে জনগণের আয় কমেছে

ক্রয়ক্ষমতা নিয়ে আলোচনায় বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা দেশের গরিব এবং নিম্ন আয়ের মানুষের প্রসঙ্গ সাধারণত উত্থাপনই করেন না। সংখ্যাগরিষ্ঠ এই অংশের ক্রয়ক্ষমতা এত কম যে, অর্থনৈতিক আলোচনায় এঁরা ব্রাত্যই থেকে যান। তাঁদের আলোচনায় উঠে আসে মূলত মধ্যবিত্তের প্রসঙ্গ। সেই মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক অবস্থা কী?

সমীক্ষা দেখাচ্ছে সেই মধ্যবিত্ত এখন প্রতিদিনকার সংসার খরচ কমাতে বাধ্য হচ্ছেন। কাটছাঁট করছেন পড়াশোনার খরচেও। শেষ বয়সের কথা ভেবে বা জরুরি প্রয়োজনে খরচের জন্য যে সঞ্চয় তাঁরা করেন বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, সেখানে সঞ্চয়ের পরিমাণও কমছে। জাতীয় পরিসংখ্যান দফতরের (এন এস ও)-র সমীক্ষায় ২০১৭-'১৮ সালে মধ্যবিত্তের এই অর্থনৈতিক দুর্দশা সামনে এসেছে। সমীক্ষায় ২০১৭-'১৮ সালের কথা বলা হলেও পরবর্তীতে এই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়েছে। সাধারণ মানুষ কেন খরচ কমাচ্ছেন? কারণ মানুষের আয় কমে গেছে অথবা অন্যান্য খরচ বৃদ্ধির সাপেক্ষে আনুপাতিক হারে আয় বাড়েনি।

সমীক্ষা অনুযায়ী মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার আগের বছর পারিবারিক সঞ্চয়ের হার ছিল ২৩ শতাংশের কোটায়। মোদি শাসনে ২০১৭-'১৮-তে তা নেমে এসেছে ১৭ শতাংশে। তা হলে প্রধানমন্ত্রী যে আচ্ছে দিনের ঢোল বাজিয়ে গেলেন কয়েক বছর ধরে কোথায় সেই 'আচ্ছে দিন'?

গরিব-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মিলে ধরে নেওয়া যায় জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ বা তার বেশি। এঁরা আজ প্রবল সংকটে। বিদ্যমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সরকারের জনবিরোধী নীতি মিলে জনগণের এই অর্থনৈতিক সংকট তীব্রতর করে তুলেছে।

সমাধান হিসাবে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ১০০ লক্ষ কোটি টাকা জনগণের হাতে তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। কীভাবে তুলে দেওয়া হবে? কোন জনগণ সেটা পাবেন? এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ কর বিধি সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ হল আয়কর কমিয়ে দেওয়া হবে। বর্তমানে ৫ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা আয়ে ২০ শতাংশ হারে কর দিতে হয়। টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ তা ১০ শতাংশ করা। তা হলে সুবিধাটা কার ঘরে যাচ্ছে? এই সুবিধা তাঁরাই পাচ্ছেন যাঁদের প্রচুর আয়। সাধারণ মানুষের ঘরে এর ছিটেফোঁটাও পৌঁছবে না। ধনীদের আরও সুবিধা করে দিতে সরকার আয়করের উপর ধার্য বর্তমান ৪ শতাংশ শিক্ষা সেস পুরোপুরি তুলে দেওয়ার কথা বলেছে। এটা করা হলে উচ্চ আয়ের মুষ্টিমেয় মানুষ সুবিধা পাবে । কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের শিক্ষার খরচ আরও বাড়বে। তা হলে মোদি সরকার আমজনতাকে কী দিল? তেল তো দিচ্ছে তেলা মাথাতেই।

তা ছাড়া কৃত্রিমভাবে পুঁজিপতিদের রাজকোষের কোটি কোটি টাকার ত্রাণ প্যাকেজ দিয়ে এই অর্থনীতিকে কত দিন সচল রাখা যাবে? অর্থনীতি যদি স্বাভাবিক বিকাশের পথ হারিয়ে ফেলে স্থবিরতায় আটকে যায়, তা হলে ভেন্টিলেশন দিয়ে তাকে তো বাঁচানো যাবে না। ভেন্টিলেশন রোগীর আয়ুষ্কাল সাময়িক বৃদ্ধি করে মাত্র।

এই সংকটগ্রস্ত অর্থনীতিকে বাঁচানোর নামে মোদি সরকার বিগত ৬ মাসে দফায় দফায় কোটি কোটি টাকার ত্রাণ প্যাকেজ দিয়েছে। তার স্বাভাবিক পরিণামে জনকল্যাণ খাতে বরাদ্দ কমেছে। আবার সরকার চালানোর জন্য যে টাকা দরকার সেটা তুলতে জনগণের উপরই মূল্য বৃদ্ধি, কর বৃদ্ধির বোঝা চাপিয়েছে। অর্থাৎ পুঁজিবাদ সৃষ্ট সব আর্থিক সংকটের বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সংকট থেকে দৃষ্টি ফেরাতে বিভেদমূলক এনআরসি আনা হলেও সংকটকে আড়াল করতে পারছে না। এই পুঁজিবাদী অর্থনীতি যে আজ আর জনগণকে সংকট ছাড়া কিছু দিতে পারে না, আবার পুঁজিবাদী সরকারের নীতিও যে জনগণের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে রচিত হয় না, মানুষের চোখে তা নগ্ন হয়ে ধরা পড়ছে।

২৩ জানুয়ারি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবসে রাজ্যে রাজ্যে পদযাত্রা

বারুইপাড়া, নদিয়া

হরিয়ানার ভিওয়ানিতে বিশাল পদযাত্রা

জামশেদপুর, ঝাড়খণ্ড

এলআইসি-র বিলগ্নিকরণের তীব্র বিরোধিতা

এলআইসির শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বিলগ্নিকরণ ও আইডিবিআই ব্যাঙ্কের পুনরায় শেয়ার বিক্রির জন্য বাজেটে অর্থমন্ত্রীর ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের সর্বভারতীয় সম্পাদক জগন্নাথ রায়মণ্ডল ২ ফেব্রুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, এলআইসির শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত বিমাকারীদের গচ্ছিত অর্থ বিপন্ন করে দেবে ও সংস্থাটিকে বেসরকারিকরণের দিকেই ঠেলে দেওয়া হবে। আইডিবিআই ব্যাঙ্কের আরও শেয়ার বিক্রির অর্থ দায়িত্ব থেকে সরকারের হাত গুটিয়ে নেওয়া এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে ব্যাঙ্কটিকে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্রই চরিতার্থ করা। আমরা এলআইসি এবং আইডিবিআই-এর কর্মচারী এবং জনসাধারণ, উভয়ের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে তাঁরা মিলিতভাবে সরকারের এই দুটি সংস্থাকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করেন।

ব্যাঙ্কে কনট্রাকচুয়াল কর্মীদের আন্দোলনের জয়

২০ জানুয়ারি শিলিগুড়িতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার জোনাল অফিস এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের রিজিওনাল অফিসে কন্ট্রাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের পক্ষ থেকে গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। এসবিআইতে বেতন কমানোর প্রতিবাদে এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে এটিএম-কর্মী সংখ্যা কমানোর প্রতিবাদে। কর্মচারীদের তীব্র বিক্ষোভের সামনে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য হন। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কমরেড জগন্নাথ রায়মণ্ডল, কমরেড গোপাল দেবনাথ, কমরেড বিজয় লোধ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

'আমরা কাগজ দেখাবো না'

মানুষ বলছে— 'কাগজ দেখাব না।' শাসকদের ঠাট্টা—'কাগজ থাকলে তো দেখাবে।' এ ব্যাপারে আপনি কী ভাবছেন?

দেশ জুড়ে এই যে লাখ লাখ মানুষ প্রতিবাদ করছেন, তাঁদের কারুর কাগজ নেই? এই যে হাজারে হাজারে উচ্চশিক্ষিত ছাত্র, বিজ্ঞানী, গবেষক পথে নামছেন, তাঁদের কারুর কাগজ নেই? এই যে অগুন্তি শিল্পী, সাহিত্যিক বিরোধিতা করছেন, তাঁদের কারুর কাগজ নেই? দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লালিত এই যে এত এত ছাত্র, এঁরা সব ভেসে এসেছে, কারুর কাগজ নেই? কোনও এক রাজ্যের সত্তর লক্ষ মানুষ একজোট হয়ে ৬৫০ কিমি লম্বা মানবশৃঙখল বানালেন, তাঁদের কারুর কাগজ নেই? আছে। এঁদের অনেকেরই আপনার থেকে বেশি কাগজ আছে। কিন্তু তাও 'কাগজ দেখাব না'।

কাগজ দেখাব না। বাড়িতে চোর ঢুকলে তাকে চিহ্নিত করতে আপনি বাড়ির বাকি বাসিন্দাদের নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে বলতে পারেন না। তাই কাগজ দেখাব না, আমার দেশের সেইসব প্রান্তিক মানুষগুলোর জন্য, যাঁদের বাড়িঘর প্রতি বছর বন্যায় ভেসে যায়, চালাটুকুও থাকে না।

কাগজ দেখাব না। অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাকা সেই প্রত্যেকটা মানুষের জন্য, জীবনের সাথে লড়তে লড়তে যাঁদের সব কাগজ জোগাড় করে ওঠা হয়নি।

কাগজ দেখাব না। আপনার বাড়ির সেইডোমেস্টিক হেল্প, সেই রাজমিস্ত্রিটার জন্য, যাঁরা এদেশেরই কোনও এক গ্রামের ভিটেমাটি ছেড়ে এসেছেন পেট চালাতে। সেই প্রত্যেকটা দিনমজুরের জন্য যাঁরা পরিবার ছেড়ে অন্য রাজ্যে পিষে মরছেন পেটের দায়ে।

কাগজ দেখাব না, এদেশের সেই প্রত্যেকটা হতদরিদ্রের জন্য যাঁদের থেকে বারবার ছয়শো সাতশো করে টাকা খেয়েও কাগজ করে দেয়নি আপনারই সিস্টেম।

কাগজ দেখাব না, সেই প্রত্যেকটা অভাগার জন্য যাঁরা দিনের পর দিন হত্যে দিয়ে পড়ে থেকেও, বছরের পর বছর আবেদন করেও কাগজে নিজের বা পরিবারের নামের ভুল আজও সংশোধন করতে পারেননি।

কাগজ দেখাব না, এদেশের সেই আঠারো লাখ শিশুশ্রমিকের জন্য যাদের বাবা-মায়েরা তাদের পরিত্যাগ করেছে।

কাগজ দেখাব না, সেই হাজারে হাজারে বৃদ্ধ বাবা মায়ের জন্য যাঁদের প্রতি বছর কুম্ভে, গঙ্গাসাগরে এক কাপড়ে ফেলে পালিয়ে যায় তাঁদেরই সন্তানরা।

ধর্ম? কীসের ধর্ম?কোন ধর্মের এঁরা? এঁরা সবাই মুসলমান?

এই প্রত্যেকটা ভারতবাসী আমার এবং আপনার আত্মীয়। ছিলেন, আছেন, থাকবেনও। এঁদের নিয়ে আপনাকে ভাবাব। এঁদের দেখিয়ে আপনাকে জিগ্যেস করব, জোর গলায় বলুন এঁদের দোষগুলো। প্রশ্ন করব, কেন আপনি নিজেরই দেশে থাকতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার দায় নেবেন! আপনাকে বোঝাব। আপনি আমি মিলে ন্যায়ের কথা বলা হবে।

আর যদি না বোঝেন, আপনি থিওরি দেখাবেন, আমি বাস্তব দেখাব। আপনি ধর্ম দেখাবেন, আমি মানুষ দেখাব। কিন্তু কত্তা, কাগজ দেখাব না।

— ফেসবুক থেকে প্রাপ্ত

ডাঃ কাফিল খান গ্রেপ্তার

আক্রান্ত বাকস্বাধীনতা

এনআরসি এবং সিএএর প্রতিবাদে মুম্বাইয়ের এক সভা থেকে ৩০ জানুয়ারি গ্রেপ্তার করা হল ডাঃ কাফিল খানকে। বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা এখন জনগণের কোনও প্রতিবাদকেই সহ্য করতে পারছেন না। কোনও কোনও মন্ত্রী তো আন্দোলনকারীদের গুলি করে মারার হুমকি দিয়েছেন। তাদের মধ্যে বঙ্গ বিজেপির সভাপতিও রয়েছেন। শীর্ষনেতাদের এমন প্ররোচনামূলক বক্তব্যে উৎসাহিত হয়ে সম্প্রতি উগ্র হিন্দুত্ববাদী এক যুবক দিল্লিতে এনআরসি বিরোধী মিছিল লক্ষ্য করে গুলিও চালিয়ে দেয়। যুবকটি যখন গুলি চালাতে উদ্যত তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নিয়ন্ত্রণাধীন পুলিশ দাঁড়িয়ে ওই দৃশ্যের ছবি তোলে। ঘটনার পরের দিনই হিন্দু মহাসভার এক নেতা টিভি- সাক্ষাৎকারে জানান, হত্যায় উদ্যত উক্ত যুবককে বীরের মর্যাদা দিয়ে তাঁরা সংবর্ধনা দেবেন। ঘটনাক্রম থেকেই পরিষ্কার, গণতন্ত্রের যে অন্যতম প্রধান শর্ত, সমালোচনার অধিকার, প্রতিবাদের অধিকার ইত্যাদি মোদি শাসনে তা মারাত্মকভাবে লঙ্ঘিত। এই ফ্যাসিস্টসুলভ আক্রমণের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। আইনজীবীদের সংগঠন লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষ থেকে ৩১ জানুয়ারি উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠানো হয়। স্মারকপত্রে ডাঃ কাফিল খানের নিঃশর্ত মুক্তি এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনা মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন, প্রস্তাবিত এনআরসি দেশের জন্য বিপজ্জনক

বিজেপি এম এল এ

এনআরসি-সিএএ-এনপিআর-এর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ-বিক্ষোভ-ধরনা আন্দোলন চলছে এবং বিজেপি এই গণতান্ত্রিক ও ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন দমন করতে আক্রমণাত্মক পথ নিচ্ছে, সন্ত্রাস নামিয়ে আনছে, তখন তাদেরই এক এম এল এ এনআরসি-সিএএ-র কড়া ভাষায় নিন্দা করেছেন। মধ্যপ্রদেশের ভোপাল জেলার মাইহারের বিজেপি এমএলএ নারায়ণ ত্রিপাঠী সম্প্রতি এক ভিডিও ট্যুইটারে বলেছেন, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন এবং প্রস্তাবিত এনআরসি দেশের জন্য বিপজ্জনক। কারণ এর দ্বারা ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে ভাগ করা হবে। ত্রিপাঠী বলেছেন, "ধর্মীয় লাইনের উপর দাঁড়িয়ে দেশ ভাগ করা যায় না। তবুও এ ভাবে ভাগ করা হচ্ছে।" বলেছেন, "রাজ্যের গ্রামের মুসলমানরা খুব আশঙ্কায় আছে এবং কারও সাথে কথা বলা এড়িয়ে যাচ্ছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, "যখন গ্রামের মানুষদের পক্ষে এবং শহরের গরিবদের পক্ষে আধার কার্ড পাওয়া কঠিন কাজ তখন নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে নথিপত্র (ডকুমেন্ট) পাবে কোথায়?" তিনি আরও বলেছেন, "এমন একটা পরিস্থিতি বিরাজ করলে, কোনও গ্রাম, মহল্লা অথবা দেশ শান্তিতে থাকতে পারে না।"

(সূত্র ঃ দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২৯ জানুয়ারি ২০২০)

নাগরিকত্বে লাগবে ধর্মের প্রমাণ

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি ঃ গত অধিবেশনে সিএএ পাশ হয়েছে। চলতি সপ্তাহে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। আজও সিএএ-র নিয়মাবলি জানাতে পারেনি কেন্দ্র। তবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আজ জানিয়েছে, তিন দেশ থেকে আসা অ-মুসলিম শরণার্থীদের নাগরিকত্বের আর্জি জানাতে নিজের ধর্মের প্রমাণ দিতে হবে। সিএএ-তে বলা হয়েছে, ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে যাঁরা ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্থান থেকে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁদের নাগরিকত্ব দেবে সরকার। প্রশ্ন উঠে ছিল, মুসলিমরা পরিচয় লুকিয়ে নাগরিকত্ব চাইলে কী হবে? শুরুতে মন্ত্রক এর জবাব না দিলেও আজ ধর্মীয় প্রমাণের বিষয়টি সামনে আনে। জানানো হয়, ওই ব্যক্তি নিজের দেশে বিভিন্ন সরকারি নথিতে যে ধর্মের উল্লেখ করেছেন সেই ধাঁচের কোনও কাগজ ভারত সরকারের কাছে জমা দিতে হবে। প্রশ্ন উঠেছে, যাঁরা এক-কাপড়ে ভিটে-মাটি ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন, তাঁরা ধর্মের প্রমাণপত্র দেখাবেন কী ভাবে? এর সদুত্তর মিলছে না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে।

(সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা)

জেলায় জেলায় এনআরসি-সিএএ-এনপিআর বিরোধী কনভেনশন-ধরনা

বাঁকুড়া ঃ এনআরসির প্রতিবাদে সমগ্র দেশ যখন উত্তাল, তখন তার ঢেউ আছড়ে পড়েছে বাঁকুড়া জেলাতেও। ১৮ জানুয়ারি এনআরসি, সিএএ-র বিরুদ্ধে আইনজীবী চিকিৎসক, অধ্যাপক, শিক্ষক সহ জেলার সর্বস্তরের নাগরিকদের উপস্থিতিতে বাঁকুড়া শহরের ভিওসি হলে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এনআরসির উপর মনোজ্ঞ আলোচনা করেন আইনজীবী অভিষেক বিশ্বাস ও বিবেকানন্দ দে।

এ ছাড়াও মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আজিজুল আলম খান ও দেবাশিষ গুহ বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা ছিলেন সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির রাজ্য কমিটির সদস্য অংশুমান রায়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব নদীয়াইন্দু বিশ্বাস। নদীয়াইন্দু বিশ্বাসকে সভাপতি এবং হাবুলাল মণ্ডলকে সম্পাদক করে ২২ জনের শক্তিশালী এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির বাঁকুড়া জেলা শাখা গঠিত হয়।

মথুরাপুর ঃ এনআরসি, সিএএ, এনপিআরের বিরুদ্ধে মথুরাপুর ১নং ব্লকের নালুয়া, লালপুর ও কৃষ্ণচন্দ্রপুর অঞ্চলের নাগরিকরা ২৫ জানুয়ারি এক কনভেনশনের মধ্যে দিয়ে গড়ে তোলেন আন্দোলনের কমিটি। কৃষ্ণচন্দ্রপুর মোড়ে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে এলাকার বিশিষ্ট কবি মজিবর রহমান পুরকাইত সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্য রাখেন জাহাঙ্গীর গাজি, ইয়াসমিনা হালদার, অনিতা চ্যাটার্জী, গুল ইসলাম মোল্লা। সারা বাংলা এন আর সি বিরোধী নাগরিক কমিটির রাজ্য কমিটির সদস্য শিক্ষক চন্দন মাইতি ও সুজিত পাত্র তাঁদের বক্তব্যে নাগরিকত্ব হরণের বিরুদ্ধে লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। শিক্ষক লক্ষ্মণ মণ্ডলকে সম্পাদক ও আব্দুল মজিদ হালদারকে সভাপতি করে ৫০ জনের শক্তিশালী নাগরিক কমিটি গঠিত হয়।

উত্তর দিনাজপুর ঃ ২৯ জানুয়ারি থেকে গোয়ালপোখরের লোধনচকে নাগরিক অবস্থান শুরু হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ ঃ ১ ফেব্রুয়ারি জেলার হরিহরপাড়ায় এনআরসি-সিএএ-এনপিআর বিরোধী নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

২৬ জানুয়ারি। পশ্চিম মেদিনীপুরের ভীমপুরে নাগরিক কনভেনশন

মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় নাগরিক কনভেনশন

মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

গোয়ালপোখর, উত্তর দিনাজপুর

নেতাজি সুভাষ ধরনা মঞ্চে লাগাতার নাগরিক অবস্থান। পলাশী, নদিয়া

ডিএসও-র উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্মেলন

২৭ জানুয়ারি এ আই ডি এস ও-র উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রায়গঞ্জের চেম্বার অফ কমার্স হলে। উদ্বোধন করেন এস ইউ সি আই (সি)-র উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক কমরেড দুলাল রাজবংশী। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড সামসুল আলম, রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক এবং রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড সুশান্ত ঢালি। শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি ও নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে এবং প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু ও জেলায় কলেজ স্থাপনের দাবি এই সম্মেলনে উঠে আসে। কমরেড হারুন আল রসিদকে সভাপতি ও কমরেড শ্যামল দত্তকে সম্পাদক করে ৩০ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

বিদ্যাসাগরের স্বপ্নপূরণের অঙ্গীকার

একের পাতার পর

তারা বলছে, অশিক্ষা-অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে এরাই আনবে রাঙা প্রভাত।

'অঙ্গীকার যাত্রা'র পরিকল্পনা হয়েছে বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে, ঝাড়খণ্ডের কর্মাটাঁড় থেকে এবং মেদিনীপুরের বীরসিংহ থেকে— তিনটি মহামিছিল। গন্তব্য কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশ। ১ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়িতে উদ্বোধন উপলক্ষে এক বিশাল ছাত্র সমাবেশ সংঘটিত হয়। এই সমাবেশ থেকে এআইডিএসও-র সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ঘোষ 'অঙ্গীকার যাত্রা'র সূচনা করেন। শিলিগুড়ি শহরের এয়ারভিউ মোড় থেকে শুরু হয়ে ইসলামপুর, রায়গঞ্জ, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, সোদপুর, বারাসত হয়ে কলকাতা। বীরসিংহ থেকে যে মহামিছিল তা খড়ার, আরামবাগ, হাওড়া হয়ে কলকাতা। কর্মাটাঁড় থেকে মহামিছিলটি আসানসোল, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া হয়ে কলকাতা— প্রাথমিক পরিকল্পনা এই।

যাত্রাপথে ইসলামপুরে বিদ্যাসাগর মূর্তিতে মাল্যদান করছেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড সামসুল আলম

কারও কারও মনের কোণায় একটু-আধটু কিন্তু-কিন্তু যে একেবারেই ছিল না, তা নয়। এত বড় কর্মসূচি— কীভাবে হবে, অমুক ক্ষেত্রে অমুকটা হলে তখন কী হবে? এসব কোথাও কোথাও একটু তো ছিলই। তবে, সে সব যেন হাওয়ার মতো মিলিয়ে গেল পথে নামার পর। নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা আবিষ্কার করল এক নতুন জগৎ। সংশয়ী দ্বিধাগ্রস্ত মনের জড়তা কাটিয়ে প্রাণচাঞ্চল্য জাগিয়ে দিল শত শত আলো। 'অঙ্গীকার যাত্রা' সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এলেন। বীরসিংহ ভগবতী স্কুলের স্টাফ রুমে প্রধান শিক্ষক, যিনি 'অঙ্গীকার যাত্রা'র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তিনি সহ, অন্যান্য সদস্যদের এবং এআইডিএসও সংগঠকদের উপস্থিতিতে মিটিং করেন। ৪ ফেব্রুয়ারি মেদিনীপুর-খড়ার পৌরসভা অতিক্রম করে অঙ্গীকার যাত্রা এগিয়েছে। খড়ার গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা (তাঁর মেয়ে গুরুতর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও) স্বেচ্ছায় উদ্যোগ নিয়ে সমস্ত ছাত্রীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

খড়ার পৌরসভার বিশিষ্ট জনপ্রতিনিধি বিনামূল্যে ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। খড়ারের তিনটি ক্লাব রাতে ছাত্রদের খাওয়ার ব্যবস্থাও করে দিয়েছে। কার্যত জনসাধারণই কর্মসূচি সফল করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ৫ ফেব্রুয়ারি দুপুরে খড়ার থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে লক্ষ্মীনারায়ণপুরের কাছে খাসবাড়ে ২৫০ জনের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এলাকার এক জন শুভানুধ্যায়ী। তিনি ছাত্রদের কর্মসূচির বিবরণ শুনে বলেন, ' তোমরা তো আমাদের বাড়ির সন্তানদের ভালর জন্য এত কষ্ট করছ। আমরা একটু সাহায্য করতে পারব না!' বীরসিংহ থেকে খড়ার হয়ে আরামবাগ পর্যন্ত সংগঠনের তেমন যোগাযোগ ছিল না। কর্মসূচির আবেগঘন আবেদনে সাড়া দিয়ে সেখান থেকেই প্রায় তিনশো ছাত্রছাত্রী 'অঙ্গীকার যাত্রা'র প্রস্তুতিতে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সামিল হয়েছে। বীরসিংহ সংলগ্ন এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে, এআইডিএসও-র কর্মী-সংগঠকরা প্রচারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের থাকার অসুবিধা হচ্ছে শুনে, বীরসিংহের একটি ক্লাব, যা গরিব আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত, তাঁরা কয়েকজন সংগঠকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। তাঁরা গভীর অনুভূতির সাথে বলেছেন, 'আমরা তো টাকাপয়সা তেমন দিতে পারব না! আর সব কিছু দিয়ে আপনাদের সাহায্য করব। যখনই অসুবিধা হবে, এখানে চলে আসবেন।'

যাত্রাপথে। ইসলামপুর

শুধু বীরসিংহ নয়, সারা রাজ্য জুড়ে, অসংখ্য মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে এই 'অঙ্গীকার যাত্রা'। রাজ্যের সর্বত্র, হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এই কর্মসূচি সফল করতে স্বেচ্ছাসেবক হয়েছেন। সারা রাজ্যে গড়ে উঠেছে অসংখ্য কমিটি। এরই সাথে গঠিত হয়েছে 'সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সংগ্রাম কমিটি'ও। মালদার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসে-ক্লাসে প্রচার করার সময় ছাত্রছাত্রীরা ব্যাপকভাবে সমর্থন জানানোর পাশাপাশি অনুষ্ঠানের খরচ বাবদ নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে দিয়েছে। মালদার জনৈক ব্যবসায়ী কর্মসূচির বিবরণ শুনে, দু'শো জন অংশগ্রহণকারীর জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কলকাতার বরানগরের বাসিন্দা এক বয়স্কা ভদ্রমহিলা কর্মসূচির আবেদনে সাড়া দিয়ে অঙ্গীকার যাত্রীদের জন্য একশো ডিম কিনে দিয়েছেন। দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ির একজন শিক্ষক ওই এলাকা থেকে যেসব ছাত্রছাত্রী 'অঙ্গীকার যাত্রা'য় অংশগ্রহণ করেছে, তাদের সমস্ত খরচ বহন করার পাশাপাশি গাড়ির ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে পাঞ্জিপাড়াতে অটো প্রচার করছিল এআইডিএসও-র কর্মী-সমর্থকরা। বহু মানুষ অঙ্গীকার যাত্রার বক্তব্য শুনে প্রচারপত্র সংগ্রহ করে স্বেচ্ছায় অর্থ সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ওখানকার এক চায়ের দোকানে ছাত্রছাত্রীরা প্রচারের পর চা খায়। কিন্তু দোকানদার কিছুতেই পয়সা নেননি। তিনি বলেছেন, 'তোমরা কোথায় পাবে!' ইসলামপুরে প্রচারের সময়, এক বয়স্ক মহিলা এগিয়ে এসে বলেন, 'আমি তো ভিক্ষা করে চলি, তোমাদের এরকম একটা বড় কাজে ১০ টাকা সাহায্য দিলাম।' কলকাতার রাসবিহারীতেও ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে বাসের ব্যবস্থা করে দেন একটি বাসরুটের ইউনিয়ন।

শিলিগুড়িতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

এই ব্যাপক জনসমর্থনের উষ্ণতা হৃদয়ে ধারণ করে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ৭ ফেব্রুয়ারি পৌঁছবে কলকাতায়। তারা মিলিত হবে বিদ্যাসাগরের প্রধান কর্মস্থল কলেজ স্কোয়ারে। বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে ছাত্রসমাবেশে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকবেন, এ দেশের সংগ্রামী বামপন্থী আন্দোলনের বিশিষ্ট জননেতা এবং এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। উপস্থিত থাকবেন সংগঠনের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব। বিস্তৃত যাত্রাপথের নানা জায়গায় ছাত্র-ঐক্য রূপে যে শত শত মশাল প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, সে আগুন-আলোকে ভিত্তি করে ঘরে ঘরে মানুষ হওয়ার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়বে। বিদ্যাসাগরের স্বপ্ন সফল হবেই।'

বীরসিংহ

শিলিগুড়ি

পাঠকের মতামত

আত্মসমীক্ষা

বর্তমান সমাজে আমরা দেখতে পাই নারী নির্যাতনের পরিমাণটা বেশি হয়ে গেছে। তা যে কারণেই হোক না কেন। বর্তমানে মানুষ যে হারে মোবাইল ফোনের অপব্যবহারে সমর্থ্য, ২০-২৫ বছর আগে তা ছিল না। বিজ্ঞান ক্রমশ উন্নত হচ্ছে। এতে যেমন সুফল হচ্ছে তেমনই কুফলও দেখা দিচ্ছে। বলা ভাল বিজ্ঞানকে কুপথে চালিত করা হচ্ছে। ব্লু-ফিলম থেকে শুরু করে বিভিন্ন অশ্লীল ছবি মানুষের মনকে ক্রমাগত বিষাক্ত করে তুলছে। এর জন্য শুধু কি সরকারকে দায়ী করা চলে? জনসমাজের কি কোনও হাত নেই এর মধ্যে? সরকার ক্রমাগত ঢালাও মদের লাইসেন্স ও ইন্টারনেটে অশ্লীল ছবি দেখার অবাধ সুযোগ-সুবিধা করে দিচ্ছে। জনসমাজও দেখছে। এতে অনেকেই কুপথে এগোচ্ছে।

আজকাল পত্রিকা খুললেই ধর্ষণের খবর আমাদের চোখে পড়ে। এর পিছনে অন্যতম কারণ মোবাইল। আমাদের সুন্দর জীবনকে বিষাক্ত পথে নিয়ে যাওয়ার এটি একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

আমাদের এই ভারত বহুকাল থেকেই দারিদ্রের মধ্যে দিয়ে চলে আসছে। এই দারিদ্রের যন্ত্রণা কেউ কেউ সহ্য করতে না পেরে কুপথগামী হতে বাধ্য হয়। এর প্রতিকার হিসাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অশ্লীল ছবি দেখানো বন্ধ করা দরকার। চাই বিচার বোধ। শুধু প্রয়োজনীয় জিনিসটি গ্রহণ করব এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিসটা বর্জন করব এই বিচার বোধ থাকা চাই নারী-পুরুষের। তা যদি না হয় তা হলে সমাজের তথা দেশের মারাত্মক ক্ষতি হবে।

ঐশী ভট্টাচার্য
শ্রীরামপুর, হুগলি

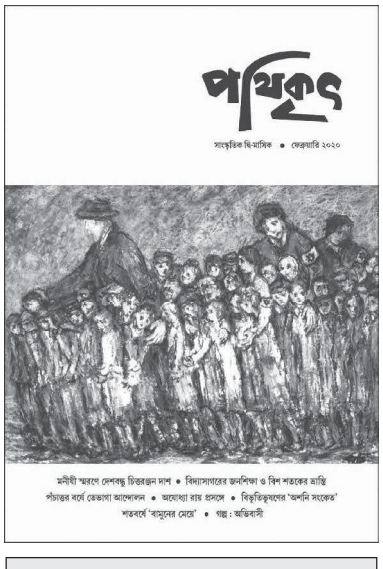

ফেব্রুয়ারি ২০২০

সংগ্রহ করুন

মূল্য ঃ ৫০ টাকা

আয়ের শীর্ষে বিজেপি

গত আর্থিক বছরে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিজেপি আয়ের শীর্ষস্থান দখল করেছে। ২০১৮-১৯ সালে তাদের মোট আয় হয়েছে ২৪১০ কোটি ৮ লক্ষ টাকা। ৬টি রাজনৈতিক দল মোট যা আয় করেছে, তার ৬৫.১৬ শতাংশ গিয়েছে বিজেপির তহবিলে। এই তথ্য জানিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এ ডি আর)।

টাকা দিচ্ছে কারা? বড় বড় শিল্পপতিরা। তারা যে কোনও দলকে এই বিপুল পরিমাণ টাকা দেবে? না। যারা তাদের স্বার্থ পূরণ করবে তাদের দেবে। বিজেপিকে কেন দিচ্ছে? বিজেপি সবচেয়ে ভালো ভাবে তাদের স্বার্থ পূরণ করে চলেছে। শিল্পপতিদের ব্যবসার জন্য স্বল্পমূল্যে জমি জুগিয়ে, স্টেট ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সাধারণ মানুষের টাকা ঋণ হিসাবে দিয়ে আত্মসাৎ করার সুযোগ করে দিয়ে, জনবিরোধী বিল পাশ করিয়ে নানা সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে।

এর আগে রাফাল যুদ্ধবিমানের বরাত আম্বানিকে পাইয়ে দিয়েছিল বিজেপি। আম্বানিও নানাভাবে বিজেপি সরকারকে সাহায্য করেছে। অস্ট্রেলিয়ার খনি ব্যবসায়ে আদানি গোষ্ঠীকে জায়গা করে দিতে স্বয়ং আদানিকে সঙ্গে করে বিমানে উড়ে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। কোন আদানি? যিনি ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদিকে ক্ষমতায় বসাতে তাঁর ডিজিটাল প্রচারের সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব বহন করেছিলেন! সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বিদেশি প্রযুক্তির মাধ্যমে সাবমেরিন তৈরির বরাত আদানিদের পাইয়ে দিতে চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না। নৌসেনার অধীনস্থ এমপাওয়ার্ড কমিটির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে তারা আদানি-ঘনিষ্ঠতাই প্রমাণ করছে। যে আদানি গোষ্ঠীর সাবমেরিন তৈরির কোনও অভিজ্ঞতাই নেই, এমপাওয়ার্ড কমিটির নির্বাচিত দুটি সংস্থার বদলে তাদেরই আহ্বান জানিয়েছে সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

শিল্পপতি ও সরকারের আঁতাত এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট। ফলে বিজেপির মতো একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দল বাৎসরিক আয়ে কীভাবে শীর্ষ স্থান দখল করে, সে কারণটা আন্দাজ করা অসম্ভব নয়। সরকারকে নির্বাচনের সময় মোটা মোটা ভেট দিচ্ছে শিল্পপতিরা, তাদের প্রচারে খরচ করা হাজার হাজার কোটি টাকার জোগান দিচ্ছে। আর শিল্পপতিরা সরকারি 'দানে' নতুন নতুন বরাত পেয়ে মুনাফার পাহাড় বাড়াতে থাকে। সরকার শিল্পপতিদের ব্যবসায়িক স্বার্থে জল-বিদ্যুৎ-জমি ও কর ছাড় দেয় বিপুল পরিমাণে। এভাবেই সম্পদের চূড়ায় পৌঁছয় শিল্পপতি গোষ্ঠীগুলি, পরিণত হয় ধনকুবেরে। কীভাবে আদানিরা ভারতের সম্পদশালীদের তালিকায় আম্বানির পরই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে, তাও স্পষ্ট হয়। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলির আয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা কংগ্রেস তাদের আমলে পুঁজিমালিকদের পছন্দের তালিকায় প্রথম স্থান দখল করে ছিল।

আসলে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে সাধারণ মানুষের 'উন্নয়নের' কথা বললেও নির্বাচনসর্বস্ব দলগুলি জনস্বার্থে সরকার পরিচালনা করে না। 'আচ্ছে দিনে'র স্বপ্ন ফেরি করা বিজেপিও পুঁজিপতিদের স্বার্থে জনবিরোধী নানা নীতি গ্রহণ করছে, নানা বিল পাশ করাচ্ছে। অথচ জনজীবনের মূল সমস্যা— মূল্যবৃদ্ধি রোধ, বেকারি রোধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। আর্থিক বৃদ্ধি ক্রমশ নিচের দিকে নামছে। চাষি-মজুরের অবস্থা দুর্বিষহ। সরকার ঋণ মকুব না করায় আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে কৃষক। এই অবস্থায় সরকারবিরোধী ক্ষোভকে চাপা দিতে সাম্প্রদায়িক বিভাজন এনে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে তারা।

বিজেপি প্রতিশ্রুত 'আচ্ছে দিন' আসলে শিল্পপতিদের, যাদের সেবা তারা করে চলেছে নিরন্তর। যারা দেশের মাত্র এক শতাংশ। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাকি ৯৯ শতাংশ জনসাধারণের উপরে লুটপাট চালাচ্ছে শিল্পপতিরা। আর সরকার ম্যানেজার হিসেবে এই লুটেরাদের সাহায্য করছে। তাই মুমূর্ষু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বাজার সংকট তীব্র আকার ধারণ করলেও সাধারণ মানুষের আয় কমতে থাকলেও, তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমতে থাকলেও পুঁজিপতিদের সম্পদ বৃদ্ধি হয়েই চলেছে। শ্রেণিবিভক্ত এই ব্যবস্থায় আর্থিক বৈষম্য বেড়েই চলেছে। তারই প্রকাশ পুঁজিপতি ও তাদের স্বার্থরক্ষাকারী দলের ক্রমবর্ধমান সম্পদ।

সরকারি রিপোর্টেই প্রমাণিত প্রাথমিক শিক্ষা গভীর সংকটে

১৫ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়েছে অ্যানুয়াল স্টেটাস অফ এডুকেশন রিপোর্ট- ২০১৯। সংস্থার সমীক্ষকরা দেশের ২৪টি রাজ্যের ২৬টি গ্রামীণ জেলার ৩৭ হাজার শিশুর উপর সমীক্ষা চালিয়ে এই রিপোর্ট তৈরি করেছেন।

রিপোর্ট বলছে, প্রথম শ্রেণির মাত্র ১৬ শতাংশ শিশু ঠিকমতো পড়তে পারে। শব্দ পড়তে পারে মাত্র ১৪ শতাংশ। ওই একই শ্রেণির ৪০ শতাংশ শিশু অক্ষরই ঠিকমতো চিনতে পারে না। ওই শ্রেণির ৪১ শতাংশ শিশু ২ অঙ্কের সংখ্যা বুঝতে পারে। মাত্র ১৯ শতাংশ এক অঙ্কের যোগ করতে পারে। এই তথ্য শাসক শ্রেণির পক্ষে যত অস্বস্তিকরই হোক, এই হল দেশের প্রাথমিক শিক্ষার গড়পড়তা হাল।

একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হল প্রাথমিক শিক্ষা। একটি শিশুর ভবিষ্যৎ বিকাশ সম্পূর্ণ নির্ভর করে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। এই রিপোর্ট আরও বলেছে শিশুটির আর্থ সামাজিক অবস্থা, মা বা মাতৃস্থানীয়ার শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্কুলের পরিকাঠামোর উপর নির্ভর করে কোনও শিশু গুণগত শিক্ষা পাবে কি না! কিন্তু তা কি আদৌ নিশ্চিত করা যাচ্ছে? যাচ্ছে না— সে তো তথ্য পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট।

'শিক্ষা বলতে শুধু রিডিং, রাইটিং, অ্যারিথমেটিক নয়, যথার্থ ও পূর্ণ শিক্ষা দাও'— বলেছিলেন এ দেশের শিক্ষা আন্দোলনের পুরোধা মহান মানবতাবাদী বিদ্যাসাগর। গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপন, পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, প্রয়োজনীয় বই ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া— এসবই তিনি আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সার্বজনীন শিক্ষা অর্থাৎ সকলের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার ভার নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সরকারে আসীন শাসক দলগুলি এই দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিল। চালু হল 'টাকা যার শিক্ষা তার নীতি' অর্থাৎ শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করা শুরু হল। ফলে শিক্ষাকে বাণিজ্যিক দৃষ্টিতে দেখার ফলে তার সার্বজনীন চরিত্রও আজ হারিয়ে গেছে।

স্কুলগুলিতে পরিকাঠামোগত সমস্যা দূরীকরণের সরকারি প্রয়াসও অবহেলিত। বিল্ডিং আছে, শিক্ষক নেই, শিক্ষক আছে, স্কুল বিল্ডিং নেই, বই নেই। রাজ্যে বহু স্কুলে একজন বা দু'জন শিক্ষক। তারা চারটি ক্লাস নেবেন কী করে? ফলে কোনও এক ক্লাসে পাঠদান চললে বাকিদের চলে খেলা। একে সরকারি স্কুলের এই হাল, তাতেও গরিব শিশুদের অন্যতম আকর্ষণ মিড-ডে মিলে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অঙ্গনওয়াড়ি, আইসিডিএস পরিচালন-ভারও তুলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি সংস্থার হাতে। স্কুলগুলিতে অভুক্ত শিশুদের খাবার, তাদের দেখভাল এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে হয়। সেগুলি বেসরকারি সংস্থার হাতে গেলে তারা ব্যবসায়িক মুনাফার স্বার্থে বরাদ্দের কতটা খরচ করবে, তাতে শিশুদের প্রয়োজন কতটা মিটবে সেই আশঙ্কা থেকে যায়। অভিভাবকেরা স্বাভাবিক ভাবেই আশঙ্কিত। যাদের কিছুমাত্র উপায় আছে, তারা ঘটি বাটি বিক্রি করে হলেও বেসরকারি স্কুলে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করতে বাধ্য হচ্ছেন। আর যাদের সেই উপায় নেই, তাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাজীবন সেখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। অঙ্কুরেই বিপর্যস্ত হচ্ছে ছোট ছোট শিশুদের শিক্ষাজীবন।

এ বছর শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ এর দশম বছর পূর্তি। আইন পাশের দশ বছর পরেও এই হল শিক্ষার হাল। এই আইন প্রণয়নের সময় তৎকালীন কংগ্রেস সরকার বলেছিল ৬ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের সকলের বিনা পয়সায় আবশ্যিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হবে। কিন্তু বাস্তবে সবস্তরেই শিক্ষার খরচ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বিজেপি সরকার একদিকে 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ'-এর স্লোগান তুলছে, অন্যদিকে শিক্ষায় ফি বাড়িয়েই চলেছে। শিক্ষার চূড়ান্ত পণ্যায়ন করে ধনী ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট করেছে। শিক্ষার অধিকার সকল ছাত্রছাত্রীর মৌলিক অধিকার। শাসক দল এবং পুঁজিমালিকদের অশুভ আঁতাতে সেই অধিকার প্রতি পদে পদে বিঘ্নিত হচ্ছে। অধিকার আদায়ে দরকার সংঘবদ্ধ আন্দোলন।

আশা কর্মীদের হাওড়া জেলা সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের প্রথম গ্রামীণ হাওড়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৬ জানুয়ারি উলুবেড়িয়া হাইস্কুলে। আশা কর্মীদের সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি, ফরম্যাট প্রথা বাতিল, ন্যূনতম মজুরি ২১ হাজার টাকা, বোনাস, পেনশন, পি এফ এবং সামাজিক সুরক্ষা সহ ১২ দফা দাবিতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ঝুমা হাজরা। মধুমিতা মুখার্জির উত্থাপিত মূল প্রস্তাবের উপর দশ জন আশা কর্মী বক্তব্য রাখেন। নিখিল বেরাকে সভাপতি, মধুমিতা মুখার্জিকে সম্পাদিকা ও মিলি মণ্ডলকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে ৩৫ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(২৮)

সিপাহি বিদ্রোহ ও বিদ্যাসাগর

ভারতে দীর্ঘ ব্রিটিশ শাসনে সিপাহি বিদ্রোহ একটি মাইলস্টোন। ১৮৫৭ সালের এই বিদ্রোহ ভারতে ব্রিটিশ শাসনকালকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে। একটি সিপাহি বিদ্রোহ পূর্ববর্তী যুগ, অপরটি বিদ্রোহ পরবর্তী যুগ। বিদ্রোহের অবসানের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে শাসনভার সরাসরি চলে যায় ব্রিটিশ সরকারের হাতে। শুরু হয় ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের পরিচালিত সরকারের শাসন। ভারত-শাসন নীতিতে ব্রিটিশ শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্ক পরিচালকদের প্রভাব ক্রমবর্ধমান হয়ে ওঠে। সরকারের শাসন-নীতিতে, দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক পরিবর্তন আসে। বিদ্রোহ পরাস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সম্রাট-রাজা-নবাব-সামন্তপ্রভুদের সামন্তী শাসন ফিরে পাওয়ার সমস্ত চেষ্টার অবসান ঘটে। মৃত্যু ঘটে পুরনো ভারতবর্ষের। যাত্রা শুরু হয় এক নতুন ভারতের উদ্দেশ্যে।

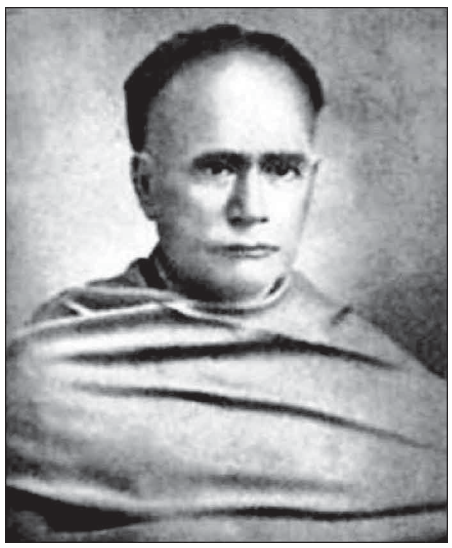

১৮৫৭ সালে বিদ্রোহের আগে ভারতে যে সমাজ সংস্কার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ সরকার সেগুলিতে কিছুটা হলেও সহায়তা করেছিল। সতীদাহ প্রথার মতো বর্বর সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার পরিণতিতে সরকার সতীদাহ নিষিদ্ধ করে আইন তৈরি করেছিল। বিধবা বিবাহের পক্ষে এবং অন্য কতকগুলি প্রথার বিরুদ্ধেও আইন তৈরি করেছিল। শাসন কায়েম রাখার প্রয়োজনে হলেও শিক্ষার বিস্তারে কিছুটা ভূমিকা নিয়েছিল। সিপাহি যুদ্ধের পর সামাজিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামেই শুধু নয়, প্রগতিশীল কাজের ব্যাপারেও সরকারের ঔদাসীন্য প্রকট হয়ে ওঠে।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেওয়ার পর (২২ জানুয়ারি, ১৮৫১) সেখানকার শিক্ষাপদ্ধতি, সিলেবাস প্রভৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটান। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে সংস্কৃত কলেজ আধুনিক বাংলা শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সরকারও ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। প্রথমে প্রতিটি জেলায় একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। বিদ্যাসাগরের স্কুল পরিচালনা এবং শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে প্রভূত অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে তাঁকে ইনস্পেক্টর হিসাবে নিয়োগ করা হয়। একই সঙ্গে তিনি বিস্তৃত গ্রাম বাংলায় আধুনিক শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ব্রিটিশের সহায়তাকে পুরোপুরি কাজে লাগান। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে দু'দশক ধরে শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রী শিক্ষা প্রচলন, বিধবাবিবাহ আন্দোলন, বহুবিবাহ রোধ, তত্ত্ববোধিনী ও সোমপ্রকাশ পত্রিকার মাধ্যমে জ্ঞানচর্চা ও সাংবাদিকতার পৃষ্ঠপোষকতা, গ্রন্থ রচনা প্রভৃতি নানা রকম সামাজিক কাজে নিযুক্ত থাকেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকর্তা হিসাবে লর্ড ডালহৌসি যখন একদিকে দেশীয় রাজ্যগুলিকে ছলে-বলে-কৌশলে গ্রাস করছেন— যা ভারতে ব্রিটিশের সামগ্রিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করেছিল— অন্য দিকে তখনই এ দেশে ব্রিটিশ পুঁজির স্বার্থে রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও ডাক চলাচলের মারফত আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নতুন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠছে।

১৮৫৪ সালে ছোটলাট ফ্রেডরিক জে হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের সহায়তায় শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হন। ১৮৫৬ সালে কলকাতার নিকটবর্তী চারটি জেলায় বিদ্যাসাগর পাঁচটি করে মডেল স্কুল স্থাপন করেন। এই সব স্কুলগুলির জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব পূরণের জন্য বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজেই একটি শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় তথা নর্মাল স্কুল স্থাপন করে। সেটিরও দায়িত্ব ছিল বিদ্যাসাগরের উপর।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহেবদের মধ্যে যাঁরা তুলনামূলক ভাবে উদার প্রকৃতির, যাঁদের চিন্তাধারায় পাশ্চাত্য নবজাগরণের প্রভাব রয়েছে, যাঁদের সাহায্য নিলে সমাজসংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারের কাজ ত্বরান্বিত হবে, বিদ্যাসাগর অকুণ্ঠচিত্তে তাঁদের সাহায্য নিয়েছেন। যদিও তিনি এই সব কাজে সাহেবদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেননি। অর্জিত জ্ঞান, চারিত্র্য-গৌরব এবং অসামান্য কর্মক্ষমতাই ছিল বিদ্যাসাগরের ঐশ্বর্য, যার দ্বারা তিনি সমাজে এবং সাহেবদের মধ্যে তথা প্রশাসনিক মহলে মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের অসামান্য দৃঢ়তা, যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত সেকুলার চিন্তাধারা এবং অফুরন্ত কর্মশক্তি— এক কথায়, যেসব গুণাবলির জন্য মাইকেল মধুসূদন বিদ্যাসাগরের মধ্যে ইউরোপীয় চরিত্রবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছিলেন— সেগুলির জন্যই সাহেব মহলে তাঁর বিরাট সম্মান এবং প্রতিপত্তি গড়ে উঠেছিল। এই প্রতিপত্তিকেই তিনি সমাজসংস্কার ও শিক্ষার প্রসারের কাজে লাগিয়ে ছিলেন।

বিপত্তি শুরু হল সিপাহি বিদ্রোহের পর ব্রিটিশের ভারতনীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে যাওয়ায়। সিপাহি বিদ্রোহের আগে পর্যন্ত ব্রিটিশ পণ্যের বাজার তৈরির স্বার্থেই খুব ধীরগতিতে হলেও সরকার ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণের কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়ে চলছিল। শিশুহত্যা, সতীদাহ নিবারণ, টিকার প্রচলন, বিধবা বিবাহ আইন চালু করা, নারী শিক্ষা প্রচলন কলেজ শিক্ষায় ভূতত্ত্ব, জোতির্বিজ্ঞানের শিক্ষাগুলির প্রচার, ডাক্তারি শিক্ষায় শবদেহ ব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয়গুলি সমাজকে অজ্ঞতা, অন্ধতা, পশ্চাৎপদতা প্রভৃতির থেকে মুক্ত হতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকারের ধারণা হয়, এই আধুনিক শিক্ষাগুলিকেই হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলে সিপাহি ও জনসাধারণকে খেপিয়ে তোলা হয়।

ব্রিটিশের এই ধারণা একেবারেই সঠিক ছিল না। কারণ সামাজিক সংস্কারের পক্ষে যে আন্দোলন তা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সমাজেই শুরু হয়। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ বা বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো ভারতীয়রাই করেছিলেন এবং তার পক্ষে দেশীয় মানুষের সমর্থন জোগাড় করেছিলেন।

এরপর থেকে ব্রিটিশ যে কোনও রকমের প্রগতিবাদী কাজে উৎসাহ দেখায়নি। তার আঘাত সরাসরি এসে পড়ে বিদ্যাসাগরের সংস্কারমূলক ও শিক্ষাপ্রসারের কাজের উপর। বিধবা বিবাহ আইন পাশের পর বিদ্যাসাগর বহু বিবাহের মারাত্মক কুফল থেকে সমাজকে মুক্ত করতে আন্দোলন গড়ে তোলেন। কিন্তু এই কাজে তিনি আর ব্রিটিশের সহায়তা পাননি। ব্রিটিশ এই সংক্রান্ত আইন পাশ করাতে রাজি হয়নি। শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের আদর্শ ও লক্ষ্যের সঙ্গে ব্রিটিশ প্রশাসন ও আমলাতন্ত্রের বারবার বিরোধ বেধেছে। বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য ছিল শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে আধুনিক মানুষ তৈরি করা। ব্রিটিশ এ দেশে সরকারি প্রশাসনে সহায়তার জন্য কিছু কেরানি তৈরি করতে চেয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই ব্রিটিশ প্রশাসন এবং শিক্ষাবিভাগের সাথে তার পদে পদে বিরোধ ঘটতে থাকে। শিক্ষার প্রসার বিশেষত স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগর সেই সময় যে বিরাট উদ্যোগ নিয়েছিলেন সে ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ মনোভাব প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এতদিন পর্যন্ত বিদ্যাসাগর শিক্ষার প্রসারে যেভাবে ব্রিটিশের সহায়তা পেয়েছিলেন তাতে তাঁর ধারণা হয়েছিল বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনেও সেই একই রকম সহায়তা পাবেন। এ ব্যাপারে এমনকি তিনি তৎকালীন ছোটলাট হ্যালিডের সমর্থন পেলেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এ কাজে সহায়তা করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। নভেম্বর ১৮৫৭ থেকে মে ১৮৫৮, এই কয়েক মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর দক্ষিণবঙ্গে চারটি জেলায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু বেঁকে বসে কর্তৃপক্ষ। জানিয়ে দেয়, সরকার এই খাতে আর কোনও টাকা খরচ করবে না। এই অবস্থায় বিদ্যাসাগর সরকারের মুখাপেক্ষী না থেকে স্কুলগুলি পরিচালনার জন্য একটি নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানভাণ্ডার খোলেন। এই ভাবে পরিচিত ব্যক্তিদের থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে তিনি বিদ্যালয়গুলিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন।

তিনি ১৮৫৮-র ২৮ সেপ্টেম্বর শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের কাছে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেন। পদত্যাগের কারণ হিসাবে এই পত্রে তিনি স্বাস্থ্যের অবনতির কথা বললেও তাতে আরও লিখেছিলেন, "ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির কোনও আশা নেই। ... তা ছাড়া কর্তব্যনিষ্ঠ কোনও আদর্শ কর্মী সরকারি বিভাগীয় কর্মচারীদের কাছ থেকে যে সহানুভূতি পাওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় মনে করেন, আমি অনুভব করছি, আমার পক্ষে আর তা পাওয়া সম্ভব হবে না।"

বলা বাহুল্য, এই সহানুভূতি না পাওয়ার কারণ ব্যক্তিগত ছিল না। ব্রিটিশ সরকার শিক্ষাসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিই পুরোপুরি বদলে ফেলেছিল। শিক্ষার মান অপেক্ষা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-শাসনের সহায়ক হিসাবে কিছু ডিগ্রিধারী বাড়ানোই তাদের প্রয়োজন হিসাবে দেখা দিয়েছিল। এর ফলে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় দেশে ডিগ্রিধারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। বিদ্যাসাগর নিছক ডিগ্রির শিক্ষা চাননি। তাই সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে নেন। ডিগ্রি-ভিত্তিক এই শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, "আমাদের যে-সব ছেলে আছে, তাদের কাছ থেকে আমরা মাহিনা নিই, পাঙ্খা ফি নিই, একজামিনেশন ফি নিই, নিয়ে কলের দোর খুলি,— দেখাইয়া দিই এইখানে মাষ্টার আছে, এইখানে পণ্ডিত আছে, এইখানে বই আছে, এইখানে বেঞ্চি আছে, এইখানে চেয়ার আছে, এইখানে কালি কলম দোয়াত পেন্সিল সিলেট সবই আছে। বলিয়া তাহাদের কলের ভেতর ফেলিয়া দিয়া চাবি ঘুরাইয়া দিই। কিছুকাল পরে কলে তৈয়ারী হইয়া তাহারা কেহ সেকেন ক্লাস দিয়া, কেহ এন্ট্রেন্স হইয়া, কেহ এল এ হইয়া, কেহ বি এ হইয়া, কেহ বা এম এ হইয়া বেরোয়। কিন্তু সবাই লেখে I has; একই পাকের তৈরি কিনা।"

সিপাহি বিদ্রোহের সময় বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ সিপাহিদের ছাউনির জন্য খুলে দিয়েছিলেন, কেউ কেউ এমন অভিযোগ তোলেন। এই অভিযোগের কোনও সত্যতা নেই। সংস্কৃত কলেজ ছিল সরকারের অধীন। তা দেওয়া না দেওয়া বিদ্যাসাগরের ইচ্ছাধীন ছিল না। বরং এর ফলে কলেজে পড়াশোনার অসুবিধা হবে— এ কথা চিন্তা করে তিনি যে কলেজ বন্ধ করতে চাননি তা কর্তৃপক্ষের সাথে তাঁর চিঠি বিনিময়েই (১১ আগস্ট, ১৮৫৭) স্পষ্ট। তার উত্তরে বাংলা গভর্নমেন্টের সেক্রেটারি তাঁকে লেখেন, (১৭ আগস্ট ১৮৫৭), "আপনার ১১ তারিখের চিঠির উত্তরে আমি ভারত সরকারের সামরিক বিভাগের সেক্রেটারির একখানি চিঠির কপি আপনাকে পাঠাচ্ছি। সেই চিঠিতে আপনি দেখতে পাবেন, হিন্দু ও মাদ্রাসা কলেজের অট্টালিকা দুটি সৈন্যদের বাসের জন্য গভর্নমেন্ট সাময়িক ভাবে দখল করবেন মনস্থ করেছেন। ... আপনাকে তাই অনুরোধ করছি যে আপনি আর বিলম্ব না করে এখনই গ্যারিসন কমান্ডারের হাতে আপনার বিদ্যালয় গৃহ ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত করবেন।" বুঝতে অসুবিধা হয় না, সরকারি হুকুম সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর কলেজ ছাড়তে দেরি করছিলেন।

সেই সময় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বহু মানুষই নানা কারণে সিপাহি বিদ্রোহকে সমর্থন করতে পারেননি। সে যুগের শিক্ষিত মানুষেরা দেখেছিলেন, বিদ্রোহের নেতৃত্বে বহু জমিদার আছে, রাজা-বাদশা আছে, তারা সিপাহি বিদ্রোহের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এসব রাজা-বাদশা হারানো রাজ্য ফিরে পেতে ধর্মীয় উন্মাদনা জাগিয়ে তুলছে। বন্দুকের টোটায় গরু ও শুয়োরের চর্বি দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের জাত মারছে বলে ধর্মীয় সংস্কারকে কাজে লাগিয়েছে। শোষক-উৎপীড়ক দেশীয় রাজা-বাদশাদের প্রতি বিদ্যাসাগরেরও বিশেষ সমর্থন ছিল না। তাই ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক রাজা-বাদশাদের বিরোধিতায় তিনি বিচলিত হননি। তিনি বিশেষভাবে ভেবেছেন এ দেশে তমসাচ্ছন্ন সামাজিক অবস্থার কথা। শিক্ষাপ্রসার ও সমাজসংস্কারের মধ্য দিয়ে মানুষকে সামন্তী কূপমণ্ডুকতা ও অন্ধতা থেকে মুক্ত করে আধুনিক মানুষে পরিণত করার পথই তিনি খুঁজেছেন। পরবর্তী কালে 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'-এর শুরুর দিকেই প্রসঙ্গক্রমে সিপাহি বিদ্রোহকে বিদ্যাসাগর 'রাজবিদ্রোহ' বলেই আখ্যায়িত করেছেন এবং ব্রিটিশ শাসকরা যে শঙ্কিত হয়ে সেই রাজবিদ্রোহ 'নিবারণ' অর্থাৎ দমন করেছিল সে কথাও তিনি স্পষ্টভাবে লিখেছেন। (চলবে)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

খোলা তারে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু
দোষীদের শাস্তি চায় অ্যাবেকা

অবহেলা এবং গাফিলতি কত দূর যেতে পারে তা দেখিয়ে দিল সিইএসসি এবং কলকাতা কর্পোরেশন। তাদের অবহেলাতেই কলকাতার হেস্টিংস মোড়ের মতো ব্যস্ত রাস্তায় গ্লোসাইন বোর্ডের বিদ্যুৎবাহী ঝুলন্ত তার লোহার রেলিংয়ে ঠেকেছিল। ৩০ জানুয়ারি রেলিংয়ে হাত দিতেই মৃত্যু হয় ২১ বছরের তরুণী সাহিদা বিবি এবং তাঁর ২ মাসের শিশুকন্যার। এই মর্মান্তিক মৃত্যু আরও চারটি শিশুকে মাতৃহারা করে দিয়ে গেল। অথচ সিইএসসি, কলকাতা কর্পোরেশন দায় ঠেলাঠেলিতেই ব্যস্ত।

বিদ্যুৎগ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকা, ৩১ জানুয়ারি হেস্টিংস থানায় স্মারকলিপি দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণে চরম গাফিলতির জন্য দায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি জানান। অ্যাবেকার প্রতিনিধিরা মৃতার পরিবারের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন।

গুলিচালনার প্রতিবাদ এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির

সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি, মুর্শিদাবাদ জেলার যুগ্ম সম্পাদক বকুল খন্দকার ও গৌতম সাহা এক বিবৃতিতে জানান, ২৯ জানুয়ারি জলঙ্গি থানার সাহেবনগরে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ), এনআরসি বিরোধী আন্দোলন ভাঙার উদ্দেশ্যে যেভাবে দুষ্কৃতীরা গুলি চালিয়ে দু'জন সাধারণ নাগরিককে হত্যা করেছে, সেই নারকীয় ঘটনার আমরা তীব্র নিন্দা করছি। কমিটির পক্ষ থেকে জেলাশাসকের কাছে দাবি জানানো হয়— (১) ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত করতে হবে, (২) অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, (৩) আন্দোলনকারী সাধারণ গ্রামবাসীদের গ্রেফতার করে অহেতুক হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

এলাহাবাদে এনআরসি-সিএএ-এনপিআর-এর প্রতিবাদ

উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদের রওশনবাগে এনআরসি-সিএএ-এনপিআর বিরোধী নাগরিক সভায় বক্তব্য রাখছেন দলের এলাহাবাদ ইউনিট ইনচার্জ কমরেড রাজবেন্দ্র। ৩০ জানুয়ারি।

মেখলিগঞ্জে নাবালিকা ধর্ষণকারীর কঠোর শাস্তির দাবি

কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডে এক নাবালিকা ধর্ষণে অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে ২৩ জানুয়ারি আন্দোলনে নামল নাগরিক সমাজ। আন্দোলনকারীদের পক্ষে রঞ্জিত রায় ও সুজন অধিকারী জানান অপরাধীর চরম শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। ধর্ষণকারীর কঠোর শাস্তির দাবিতে মেখলিগঞ্জে মহিলারাও মুখে কালো কাপড় বেঁধে প্রতিবাদে নামেন।

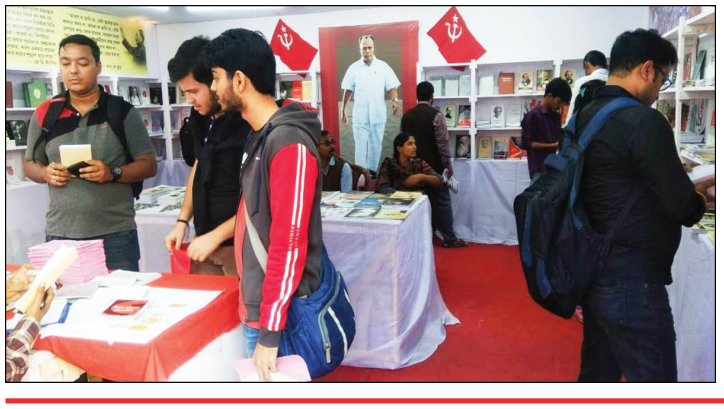

কলকাতা বইমেলায় গণদাবী স্টলে (৩৭৫) দলের প্রকাশিত বই পত্র কিনতে আগ্রহী ছাত্র-যুবকেরা

- লক্ষ লক্ষ আদিবাসী ও বনবাসী মানুষকে উচ্ছেদের প্রতিবাদে
- ভারতীয় বনাঞ্চল আইন সংশোধনী ২০১৯ বাতিলের দাবিতে
- আদিবাসী ও বনবাসীদের জীবন জীবিকা বাস্তু সংস্কৃতি ও ভাষা রক্ষার দাবিতে আন্দোলন তীব্র করতে

ট্রাইবাল ফোরামের আহ্বানে
৩০ মার্চ দিল্লি অভিযান

১১ দফা দাবিতে মিড ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ কলকাতায়

তীব্র বঞ্চনার শিকার মিড মিল কর্মীরা। মাসিক পারিশ্রমিক মাত্র ১৫০০ টাকা। তাও ১২ মাসের মধ্যে ১০ মাস দেওয়া হয়। বাকি ২ মাসের টাকা দেওয়া হয় না গরমের ছুটি-পুজোর ছুটির অজুহাতে। এই সামান্য টাকাও চার-পাঁচ মাস আবার বাকি থাকে। হরিয়ানায় পারিশ্রমিক ৩৫০০ টাকা, কেরালায় ৬৫০০, তামিলনাড়ুতে ৭৫০০ টাকা হলেও পশ্চিমবঙ্গের কর্মীরা তার অর্ধেকও পায় না। এই সীমাহীন বঞ্চনার প্রতিবাদে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন ৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় বিক্ষোভ দেখায়। তাদের প্রধান দাবি এই প্রকল্পের বেসরকারিকরণ চলবে না, কর্মীদের সরকারি স্থায়ীকর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে। এ দিন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে এক সুসজ্জিত মিছিল ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলের অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। কিছু দূর যেতেই পুলিশ মিছিলের গতি রোধ করে। ক্ষোভে ফেটে পড়েন কর্মীরা। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সনাতন দাস। প্রধান বক্তা এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস আন্দোলন তীব্রতর করার আহ্বান জানান। বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুশীল মিস্ত্রি, মালদার তসলিমা বিবি, পশ্চিম মেদিনীপুরের কবিতা বেরা ও হাওড়ার নিখিল বেরা। বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা তাঁদের চাকরি জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরেন। সনাতন দাসের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ করে।

এ আই ইউ টি ইউ সি-র ২১তম
সর্বভারতীয় সম্মেলন

১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০
ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড

প্রকাশ্য সমাবেশ

১৩ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টা, কোহিনুর ময়দান

সভাপতি ঃ কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ, সর্বভারতীয় সভাপতি
প্রধান বক্তা ঃ কমরেড শংকর সাহা, সাধারণ সম্পাদক
বক্তা ঃ কমরেড সত্যবান, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, কমরেড শংকর দাশগুপ্ত, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, কমরেড রবীন সমাজপতি, রাজ্য সম্পাদক, এস ইউ সি আই (সি), ঝাড়খণ্ড

প্রতিনিধি সম্মেলন

১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি

প্রধান অতিথি— কমরেড প্রভাস ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক এস ইউ সি আই (সি)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com